দ্রৌপদীর শাড়ি

বুদ্ধদেব বসু
প্রণীত
কবিতাভবন
প্রকাশিত

কবিতা

কঙ্কাবতী
নতুন পাতা
এক পয়সায় একটি
বিদেশিনী
দময়ন্তী
দ্রৌপদীর শাড়ি

প্রবন্ধ ও ভ্রমণ

সব-পেয়েছির দেশে
উত্তরতিরিশ
কালের পুতুল

গল্প ও উপন্যাস

গল্পসংকলন
একটি সকাল ও একটি সন্ধ্যা
একটি কি দুটি পাখি
বিশাখা
সাড়া

বুদ্ধদেব বসু-র গ্রন্থপঞ্জী কবিতাভবন-কর্তৃক প্রকাশিত হয়েছে

দ্রৌপদীর শাড়ি

বুদ্ধদেব বসু



১৯৪৮



কবিতাভবন
কলকাতা ২৯

কবিতাভবন, ২০২ রাসবিহারী এভিনিউ, কলকাতা ২৯ থেকে
লেখক-কর্তৃক প্রকাশিত

প্রথম প্রকাশ
মার্চ : ১৯৪৮
ফাল্গুন : ১৩৫৪

আড়াই টাকা

মডার্ন ইণ্ডিয়া প্রেস, ৭ ওয়েলিংটন স্কোয়ার, কলকাতা থেকে
শ্রীব্রজেন্দ্রকিশোর সেন কর্তৃক মুদ্রিত

সূচীপত্র

মায়াবী টেবিল

তাহ'লে উজ্জ্বলতর করো দীপ, মায়াবী টেবিলে
সংকীর্ণ আলোর চক্রে মগ্ন হও, যে-আলোর বীজ
জন্ম দেয় সুন্দরীর, যার গান সমুদ্রের নীলে
কাঁপায়, জ্যোছনায় যার ঝিলিমিলি-স্বপ্নের শেমিজ
দিগ্বিজয়ী জাহাজেরে ভাঙে এনে পুরোনো পাথরে।
তাহ'লে উজ্জ্বলতর করো দীপ, যে-দীপের ছায়া
ঘাস, গাছ, রোদ্দুরের অন্তহীন আশ্চর্য কাপড়ে
পৃথিবীরে রূপ দেয়, যে-রূপেরে লক্ষ হাতে হাওয়া
যদিও নিত্যই ছেঁড়ে, তবু পাতাঝরার চীৎকার
হার মানে, স্তব্ধ হয়, ছন্দ পায় যার প্রতিভায়।
তাহ'লে উজ্জ্বলতর করো দীপ, করো অঙ্গীকার
সেই আলো, যে দেয় জীবনে মুছে, যৌবনে নিবায় ;
রঙের তরঙ্গে বেঁধে তপ্ত ঘন খনির কোরকে—
ধাতুর প্রাণের পদ্মে, পাথরের রক্তের শিরায়
জ্বালায় অব্যর্থ, ক্রূর, অফুরন্ত চোখের হীরকে।

দ্রৌপদীর শাড়ি

রোদ্দুরের আঙুলে আঁকা
মেঘের চেরা সিঁথি
হঠাৎ খুলে দিলো স্মৃতির
অন্তহীন ফিতে।
এমনি এক মেঘেলা দিন
সীমান্তের শাসনহীন,
ভবিষ্যৎ দেখা না যায়,
অতীত হ'লো হারা।
দুঃস্বপনে পড়িলো মনে
দ্রৌপদীর শাড়ি।

সেদিন মেঘে সোনার পাড়,
রৌদ্র ভিজে-ভিজে;
গাছের গায়ে আছাড় দেয়
হাওয়ার হিজিবিজি।
দুপুর যেন বিকেল, আর
বিকেল হ'লো অন্ধকার;
সন্ধ্যাকাশে উচ্চহাসে
সূর্য পেলো ছাড়া।
দুঃশাসন করিলো পণ
দ্রৌপদীর শাড়ি।

ভাঙলো ঘুম, লাল আগুন
ধৈর্যহীন শিরায়
উল্লসিত হুল্লোড়ের
আনলো কড়া নাড়া
আকাশে তারই স্বৈরাচার ;
কখনো নীল মেঘের ভার,
আলোর বাঘ কখনো ছায়া-
হরিণে করে তাড়া ;
আশার দাঁত চিবিয়ে ছেঁড়ে
দ্রৌপদীর শাড়ি।

স্বর্গে আর মর্ত্যে যেন
বাঁধিয়া দিলো সেতু
অচির-পরিবর্তনের
তুমুল মত্ততা।
আলো-ছায়ার খেলার ঘরে
ভীষণ ঝড় ঝাঁপিয়ে পড়ে,
বজ্র শুনে লাফিয়ে ওঠে
বিদ্যুতের খাঁড়া ;
মুষলধারে সাহস টানে
দ্রৌপদীর শাড়ি।

প্রতিশ্রুত হাতুড়ি এলো
অন্ধকারে ছুটে,
বাড়ালো হৃৎপিণ্ড তার
চাঁদের মতো মুঠি।
আকাশ ভ'রে উঠলো সোর,
মেঘের ঘোর, জলের তোড়;
মন্ত্র-পড়া অন্তরাল
দিলো না তবু সাড়া।
অসম্ভব দ্রৌপদীর
অন্তহীন শাড়ি।

রূপান্তর

দিন মোর কর্মের প্রহারে পাংশু,
রাত্রি মোর জ্বলন্ত জাগ্রত স্বপ্নে।
ধাতুর সংঘর্ষে জাগো, হে সুন্দর, শুভ্র অগ্নিশিখা,
বস্তুপুঞ্জ বায়ু হোক, চাঁদ হোক নারী,
মৃত্তিকার ফুল হোক আকাশের তারা।
জাগো, হে পবিত্র পদ্ম, জাগো তুমি প্রাণের মৃণালে,
চিরন্তনে মুক্তি দাও ক্ষণিকার অম্লান ক্ষমায়,
ক্ষণিকেরে করো চিরন্তন।
দেহ হোক মন, মন হোক প্রাণ, প্রাণে হোক মৃত্যুর সঙ্গম,
মৃত্যু হোক দেহ, প্রাণ, মন।

নির্বোধ প্রাসাদ

বার-বার করেছি আঘাত
খোলেনি দুয়ার ;
নিরুত্তর নির্বোধ প্রাসাদ,
অবরুদ্ধ অন্তঃপুর নিঃসাড় পাষাণে।
চিক্কণ চূড়ায় ওঠে শব্দহীন উদ্ধত নিষেধ,
মনোলীনা মণিকার আচ্ছাদনী মেদ।

কোনো মৃতার প্রতি

'ভুলিবো না'—এত বড়ো স্পর্ধিত শপথে
জীবন করে না ক্ষমা। তাই মিথ্যা অঙ্গীকার থাক।
তোমার চরম মুক্তি, হে ক্ষণিকা, অকল্পিত পথে
ব্যাপ্ত হোক। তোমার মুখশ্রী-মায়া মিলাক, মিলাক
তৃণে-পত্রে, ঋতুরঙ্গে, জলে-স্থলে, আকাশের নীলে।
শুধু এই কথাটুকু হৃদয়ের নিভৃত আলোতে
জ্বেলে রাখি এই রাত্রে—তুমি ছিলে, তবু তুমি ছিলে।

নদী, তুমি নটী

নদী, তুমি নটী,
ছন্দের হিল্লোলে তব কাঁপে স্বচ্ছ কটি।
জ্বলে সূর্য অতল তরল চোখে,
দীপ্ত জানু ঝলে চন্দ্রালোকে,
বেণীবন্ধে তারাস্রোত, বক্ষের স্পন্দনে
লাবণ্যের মুহূর্ত-মণিকা।
নদী, তুমি নটী।
দিন-রাত্রি তোমার চরণে
চঞ্চল নূপুর,
মণিবন্ধে কঙ্কণের মতো
দিগন্তের আবর্তন।
তোমার মধুর রক্তে সমুদ্রের উদ্দাম লবণ
প্রচ্ছন্ন-প্রখর।
মুক্ত তুমি, তীব্র তুমি, তুমি আত্মহারা,
নটী, তুমি নদী।
তোমারই জঙ্গম প্রাণ মাঠে ফুল, মেঘে ইন্দ্রধনু ;
স্বপ্নের মর্মর-তনু
উন্মোচিত অতনু ভঙ্গিতে—
সে-স্বপ্ন আমার।

হে নর্তকী,
নাও তুমি আমার স্বপ্নের স্পর্শ,
দাও মোরে তোমার কম্পন-কণা।

তোমার অঙ্গের রঙ্গে, তরঙ্গের শাণিত আভায়
দীর্ণ করো আমার পাষাণ-পুঞ্জ,
আমার প্রাণের স্তব্ধ আদিম পাহাড়ে
মূর্ত হোক তোমার পূর্ণতা।

অতলান্তা

জড়ায়ে গেলো সে সন্ধ্যামেঘের স্বর্ণজালে,
বন্দী হ'লো সে চন্দ্র-তারার ইন্দ্রজালে,
বাজে তারই সুর রাত্রিদিনের ছন্দে-তালে,
অতলান্তারে হারাতে পারি না, পারি না।

একবার যারে পেয়েছি, সে মোর চিরন্তনী,
তাই তো আকাশে আলো-আঁধারের আবর্তনী,
তাই তো এখনো জীবন-সাধন অবন্ধনী
দুঃখসুখের ক্ষুদ্র সীমার অন্তরালে।
অতলান্তারে হারাতে পারি না, পারি না।

কোনো বন্ধুর জন্মদিনে

চেনা-অচেনার দ্বন্দ্ব ঘুচুক
জন্মদিনে,
গ্রহতারকার ছন্দে নাচুক
তুচ্ছ দিনের দুঃখ ও সুখ।
যে-অভিসন্ধি করেছে বন্দী
জীবন-ঋণে,
তারই বাঁকা আলো জ্বালো, ঘরে জ্বালো
জন্মদিনে।

সে আছে তোমার অন্ধ দিবার
অন্তরালে,
পূর্ণ প্রাণের চন্দ্রালোকের
ইন্দ্রজালে।
চিরন্তনীর ক্ষণিক চিহ্ন
বস্তুর জাল করুক ছিন্ন।
রাত্রিশেষের যাত্রীরে নিক
পলকে চিনে
স্বপ্নমাখানো আঁখি অনিমিখ
জন্মদিনে।

সলজ্জ আষাঢ়

মেঘে-মেঘে হ'লো প্রসাধন শেষ, শেষ হ'লো ছায়া-সজ্জা,
আষাঢ়, তোমার এখনো কেন এ-লজ্জা।
কেন থরোথরো দ্বিধাভরে যাও থমকি'
পরুষ রৌদ্রপরশে সহসা চমকি',
কেন এসে তবু আসো না।
ঝরে তব ছায়া নীরব শ্যামল-সবুজে।
পূর্ণহৃদয় অধরে তোমার তবু-যে
বাধো-বাধো আধো ভাষণা।
আষাঢ়, তোমার এখনো কেন এ-লজ্জা।

হে কুমারী, তুমি বধূ হবে ব'লে আকাশে বাসর-শয্যা,
প্রেমিকেরে করো করুণা, কোরো না লজ্জা।
দেখা দাও তুমি, যে-রূপে সে চায় তোমারে,
নির্ভয়ে ভাঙো আলো-আঁধারের সীমারে,
অকূলপ্রণয়প্লাবনা!
রাত্রিদিনের লক্ষ ঋণের দীনতা
লুপ্ত করুক অরূপ সময়হীনতা,
ওগো অশাসনবাসনা।
হে আষাঢ়, আর কোরো না, কোরো না লজ্জা।

বৃষ্টি

এসো বৃষ্টি,
এসো তুমি অতল ভূতলে রুদ্ধ স্তম্ভিত পাষাণে
দীর্ঘ দগ্ধ প্রতীক্ষার পরে।
এসো যেথা তপ্তবাষ্পনিশ্বাসী পাহাড়
অনন্তকালের ধৈর্য ধূমল অক্ষরে
লিখে যায় ক্লেদময় মেদগাত্র-'পরে।
এসো সেই প্রাথমিক সুপ্তির পাথরে
সৃষ্টির আদিম বীজ যার বক্ষে লীন।
এসো তুমি অর্ধ-সৃষ্ট অস্পষ্ট অতলে
মাটি যেথা জল হ'য়ে ঝরে, জল যেথা অগ্নি হ'য়ে জ্বলে,
অগ্নি যেথা বায়ু হ'য়ে শূন্যে মিশে যায়।
এসো মগ্ন কল্পনার মূলে, এসো তুমি সত্তার শিকড়ে,
মুক্ত করো সৃষ্টির উদ্দাম বীজ,
ছিন্ন করো স্তব্ধতার পাষাণ-শৃঙ্খল।
তোমার ঝঞ্ঝার স্বরে শূন্যতার কুহরে-কুহরে
জন্মের প্রচণ্ড মন্ত্র উচ্চারিত হোক ;
ভেসে যাক স্খলিত পাহাড়
বিগলিত বস্তুর বন্যায়।
মাটি হোক কঠিন কোমল,
জল হোক তরল শীতল,
অগ্নি হোক উদ্দীপ্ত উজ্জ্বল,
রূপ হোক, ছন্দ হোক, সৃষ্টি হোক, হোক বিশ্বলোক।

নূপুর

কবিতা, আর কোরো না দেরি, কবরী বাঁধো, পরো নূপুর,
ছাখো-না মেঘে আঁধার হ'য়ে আবার এলো খর ছুপুর।
বৈশাখের শুখানো চাঁপা উড়ায়ে
আষাঢ় দিলো যূথীর আশা ছড়ায়ে,
আকাশ থেকে ছু-হাত আছে বাড়ায়ে
ঘাসের বুকে গাছের সুখে যত মধুর।
পরো নূপুর, পরো নূপুর, পরো নূপুর।

কবিতা, এই মেঘের দিনে সবই তোমার ভালোবাসার,
তোমার খুশি মন করেছে, বৈশাখে তাই এলো আষাঢ়।
তোমার চোখে পড়বে ব'লে বিকালে
অস্ত-রবির রঙিন লিপি লিখালে,
বৃষ্টি-পড়া রাতের চাঁদে মাখালে
অশ্রু-মেশা হাসির নেশা নববধূর।
পরো নূপুর, পরো নূপুর, পরো নূপুর।

কবিতা, ছাখো তোমারে ডেকে প্রেমিক হ'লো সারা ভুবন,
রূপের রঙে সাজায় সেবা রাত্রি-দিবা যেন ছু-বোন।
অবাধ জল সোহাগ দিয়ে জড়ালো,
বাতাসে প্রেম পরশ হ'য়ে ছড়ালো,
আকাশ ভ'রে হাজার তারা ঝরালো
সুদূর কালে আলোর তালে তোমারই সুর—তুমি যে-সুর।
বাজো, নূপুর ; বাজো, নূপুর ; বাজো, নূপুর।

শ্রাবণ

আমার মনের অবচেতনের তিমিরে
কত-যে কথার জোনাকি
লাজুক আলোকে খুঁজে-খুঁজে ফেরে তোমারে-
শ্রাবণ, তুমি তা জানো কি ?

খরবরিষণঝংকৃত ঘন নিশীথে
মরে সে গুমরি'-গুমরি'
ঝরঝরস্বরে নিজেরে নিবিড়ে মেশাতে :
শ্রাবণ, এ-সুর তোমারই।

মেঘমন্থন মন্ত্র তোমার শাণিত
লাল বিদ্যুতে বিলসে,
ছায়াচ্ছন্ন নীল দিগন্ত শুনি-তো
তোমারি কাহিনী বলে সে।

হে কবি-শ্রাবণ, তোমার পূর্ণ প্রতিভা
আমারে কখনো ছোঁবে না ?
তারে-তারে এলো থরোথরো সুর যদি-বা
বাণীহীনা র'বে কি বীণা ?

আদিম আঁধারে বাঁধা হীরকের যে-খনি
তোমারেই, কবি, দেবো তা,
ধাতুর হাতুড়ি-আঘাতে জাগবে যখনই
শুভ্রশিখার কবিতা।

দুই পূর্ণিমা

জানি না কেন সে-কথা মনে পড়ে।

শ্রাবণ-রাতে প্লাবন এলো

পূর্ণিমার ঝড়ে।

ঝরিছে আলো আকাশে, যেন

মৌন সিনেমার

স্বপ্ন-নীল চন্দ্রালোকে

মগ্ন চারিধার।

মৃদু মেঘের লজ্জা ছিলো,

বাতাসে ছিলো মধু,

বক্ষে ছিলো লক্ষ যুগের বঁধু।

নয়ন ভরা অনিদ্রায়

শ্রবণ ভরা বাণী,

লিখেছিলাম আপন মনে

কবিতা একখানি।

ছিলো না দ্বিধা, ছিলো না বাধা,

ছিলো না আয়োজন,

সহজে খুশি হ'তে-না-জানা

সমালোচক-মন।

আত্মহারা বেগে যেমন

ঝর্ণাধারা ছোটে,

লেখনী-মুখে আখরগুলি

তেমনি দ্রুত ফোটে।

বয়স ছিলো সতেরো সেই দিন,
ইচ্ছা দিয়ে শুধেছি নব-
যৌবনের ঋণ।
সুখের মোর ছিলো না শেষ,
দুঃখে ছিলো মধু,
বক্ষে ছিলো চিরকালের বঁধু।
তারই পরশ বিশাল নীল
নিশীথে যেন মেশে।
কবিতাখানি লিখেছিলাম
কত-না ভালোবেসে।

কেন-যে সেই কবিতা পড়ে মনে
আশ্বিনের আকাশ হ'তে
শিউলি-বরিষনে।
আবেশহারা বাতাসে আর
আবেগহারা মেঘে
ঈষদলস সফলতার
শান্তি আছে লেগে
মুহূর্তের মূর্ত রূপ
শিশির ঝ'রে যায়
সান্ত্বনার তন্দ্রা এনে
মনের দরোজায়।

প্রৌঢ় এই পূর্ণিমার
স্তব্ধ অবসরে
জানি না কেন সে-কথা মনে পড়ে।
কবে-যে সেই কবিতা হ'লো
ধূলিতে অবনতা,
ভুলিতে তবু পারিনি তার
অসীম মদিরতা।
কী-কথা সব লিখেছিলাম
কে আর মনে করে,
লিখেছিলাম, এ-কথাটাই
হৃদয় আছে ভ'রে।
কবিতা গিয়ে রহিলো জেগে
কবিতা-লেখা রাত,
আনন্দিত অনিদ্রার
উদার ছায়াপাত।
বয়স এলো চল্লিশের কাছে,
সতেরোতর সে-রাত্তি যেন
এখনো বেঁচে আছে।
এখনো সেই স্বপ্ন-নীল
পূর্ণিমার নেশা
বক্ষে মোর দিতেছে দোল,
রক্তে আছে মেশা।

স্মরণে তার আশ্বিনের
সীমান্ত-শান্তিরে
আবার যেন শ্রাবণ দিলো
আশঙ্কায় ছিঁড়ে—
সে-রাত নয়, সে-চাঁদ নয়,
স্মৃতির ভার শুধু;
তবু কি নেই, আজও কি সেই
চিরকালের বঁধু?

কালো চুল

আজও তো মনে হয় মেঘ যেন মেঘ নয়, কার চুল,

কার চুল, কালো চুল, এলো চুল,

কঙ্কাবতীর কালো এলো চুল!

কঙ্কাবতী তার কালো চুল খুলে দিলো সন্ধ্যার সোনালি বারান্দায়,

স্বর্গের মায়াবী বারান্দায়,

লাল সূর্যাস্তের জানলায়;

লাগলো আলো চুলে, জাগলো উচ্ছ্বাস স্বচ্ছ সবুজের,

বিলোল হলুদের আগুনে বেগনির বিশ্রাম,

উষ্ণ বাদামির হৃদয়ে ধূসরের শান্তি,

রঙের অঙ্গনে আঁধার সন্ধ্যার শান্তি।

আর্দ্র-উজ্জ্বল ধারালো-ছলোছলো ভাদ্রের হলদে বারান্দায়

কঙ্কাবতী এসে দাঁড়ালো।

খুলে দিলো কালো চুল, আহা কী কালো চুল! লাল সূর্যাস্তের সন্ধ্যায়।

খুলে গেলো পশ্চিমে সূর্যের জাদুকর জানালা

রঙের রূপসীরা বাড়ালো মুখ ঐ শৌখিন প্রাসাদের জানলায়,

দাঁড়ালো দলে-দলে রৌদ্রের প্রাসাদের ধারালো-জ্বলোজ্বলো জানলায়,

পশ্চিমে অন্তিম সূর্যের জানলায়-জানলায়।

তবু তো পার হ'য়ে উত্তাল-লাল আর উদ্দাম হলুদের বন্যা

কখন তুমি এলে, কঙ্কা!

সিন্দূর-আলতার হলদে-লালে জ্ব'লে আহ্লাদে গ'লে যাক সন্ধ্যা,

রাত্রি তুমি নিলে, কঙ্কা।

তোমার কালো চুল ছড়ায়ে দিলে দূর নীল দিগন্তের প্রান্তে,
মত্ত বিপ্লবী অপলাপ পার হ'য়ে দাঁড়ালে শাশ্বতী শান্তি ;
আর্দ্র-উজ্জ্বল তীব্র-থরোথরো ভাদ্রের সৌম্য সীমান্তে
আশ্বিন এনে দিলে, কঙ্কা !

সৌর-শৌখিন দীপ্ত জানালায় নিবলো একে-একে
রেশমি রূপসীরা ; সোনালি অপ্সরী সাজলো সবুজে ;
হলদে আগুনের রঙ্গ থেমে গেলো বেগনি-বাদামির
অলীক অঙ্গনে ; রঙের রঙ্গের রঙ্গমঞ্চের পঞ্চ অঙ্ক
হঠাৎ হ'লো শেষ ; সন্ধ্যাতারা-ফোটা শান্ত আশ্বিনে
তীব্র ভাদ্রের সন্ধ্যা নিবলো ; বাজলো ঘণ্টা
শিউলি-শিশিরের ; নামলো নিঃসীম নীলিম রাত্রি
ধূসর সুন্দর দূর দিগন্তে ; আলোর উল্লোল
আকাশ ডুবে গেলো কালোর বন্যায়,
তোমার নীল-কালো চুলের বন্যায়, কঙ্কা, কঙ্কা !
বাজলো ঘণ্টা 'কঙ্কা ! কঙ্কা !' অন্ধকারে আর
সন্ধ্যাতারকার স্তব্ধ সবুজে । সব তো হ'লো শেষ ;
এখন শুধু তুমি, শব্দ শুধু শুনি 'কঙ্কা, কঙ্কা,
কঙ্কা, কঙ্কা !'
তারার কম্পনে লক্ষ-কোটি যুগ বাজায় কঙ্কণ
'কঙ্কা, কঙ্কা !'
আঁধার আকাশের হাজার বিশ্বের বহ্নি হ'লো লীন
তোমার কালো চুলে,

তারার অগ্নিতে ছড়ালো মগ্নতা তোমার কালো চুল ;
তোমার কালো চুল যুগ-যুগান্তের দূর সীমান্তে
ছড়ালো শান্তি, অতল অন্তিম শান্তি, শান্তি,
শান্তি, কঙ্কা,
কঙ্কা, শান্তি।

কঙ্কা, তুমি যেই দাঁড়ালে বিশ্বের ছায়াপথে ছড়ানো বারান্দায়,
দাঁড়ালে চুপ ক'রে কুটিল জঙ্গম কালের ক্রান্তির প্রান্তে,
একটু মুখ তুলে খুলে দিলে কালো চুল লক্ষকোটি তারা ছড়ায়ে,
অমনি শান্তি, শান্তি নামলো,
থামলো ক্রান্তির মত্ত উচ্ছ্বাস,
ডুবলো কালো চুলে বস্তু-বিশ্বের ব্যস্ত উচ্ছ্বাস,
ডুবলো বিপ্লব নিশীথ-নিঃসীম নীল সমুদ্রে,
কঙ্কা, কঙ্কা!
আঁধার-বন্যায় হাজার বিশ্বের তারার বুদ্বুদ
ফুটলো, ডুবলো ;
বিশ্ব-বস্তুর বুকের বিদ্যুৎ মিশলো কালো চুলে—
শান্তি, শান্তি।
মত্ত অস্থির রঙিন দৃশ্যের নৃত্য ফেলে দিলো
লজ্জা, সজ্জা ;
মগ্ন হ'লো তার নগ্ন সত্তা স্তব্ধ রাত্রির
লগ্নে, কঙ্কা ;

কঙ্কা, তুমি এই স্তব্ধ গম্ভীর আদিম অন্তিম
রাত্রি, শান্তি ;
সব তো হ'লো শেষ, এখন শুধু তুমি, তোমার কালো চুলে
শান্তি, শান্তি।

অভিষেক

আমি তো বুঝিনি কবে যুবরাজ-গ্রীষ্মের স্বরাজ
কেড়ে নিলো বিপ্লববিলাসী বর্ষা ; কখন আকাশে
শ্রাবণের বাণিজ্যের দিগ্বিজয়ী মৌশুমি জাহাজ
চূর্ণ হ'য়ে ছড়ালো গোপন পণ্য নীলের বিন্যাসে,
অধমর্ণ অক্ষম মেঘের বর্ণে, হলুদে, সবুজে,
লালে, সোনালির আশ্চর্য অলীকে ; তারপর দূর
দিগন্তের ধূসর কম্পনে লীন, সন্ধ্যার গম্বুজে
রেখে গেলো সন্ধ্যাতারা, অন্ধকারে নিঃসঙ্গ, বিধুর।

বিধুর ?···তাহ'লে কেন শান্তি ঝরে শেফালি-শিশিরে,
রাত্রি কেন ধ্রুপদী তারায় মগ্ন, তৃপ্ত কেন দিন ?
ঐ। ঐ। বৈশাখের যুবরাজ রাজা হ'য়ে ফিরে
এলো আজ, এলো শুভ্র, শুদ্ধশীল, মনস্বী আশ্বিন।
অগ্রিম-অঘ্রান যেন অন্তিম-শ্রাবণে দিলো ঘিরে
ক্ষমার ক্ষমতা দিয়ে, শ্রীলতার শৃঙ্খলে স্বাধীন।

কার্তিকের কবিতা

গ্রীষ্মপ্রেমিক, বর্ষাবিলাসী আমি,
দীর্ঘসূত্রী দিবস আমার প্রিয়,
তবু এ-নবীন-হেমন্তদিন যেন
মাঝে-মাঝে মোর মনে হয় রমণীয়।

দক্ষিণায়ন ক্লান্ত তপনে একটু-একটু ক'রে
কাছে টেনে নেয় রোজ,
শীতের সঙ্গে কার্তিক তার
অনতিব্যক্ত আত্মীয়তার
চিহ্নগুলির দিনে-দিনে করে খোঁজ।
সহসা শিহরি' কৃশ দু'পহরে
উত্তর বায় বার্তা বিতরে,
'নেই, দেরি নেই আর।'

আবার কখনো সান্ধ্য আকাশে
ক্ষীণ বৈশাখী মায়া,
কখনো মেঘের মেদুর ধূসরে
যেন শ্রাবণের ছায়া।
এই তো সেদিন বৈশাখ ছিলো
দীপ্ত রেখায় আঁকা,
মনে হয় যেন মুখ ফেরালেই
পাবো শ্রাবণের দেখা।

আসলে এখনো মনে-মনে আমি
ছিনু গ্রীষ্মের দেশে,
সহসা শিশির-পরশে বাতাস
ব'লে চ'লে গেলো ভেসে—
'নেই, নেই, আর নেই।'
ভাবতে পারি না একটি বছর
গেলো এত সহজেই।

গ্রীষ্মের লাগি' নিশ্বাস ফেলি আমি :
—এখনও সে কত দূর !
কবে যে আবার আর্দ্র আঁধারে
ভরা ভাদ্রের ঝরঝরধারে
সব রূপ হবে সুর !
মনে-মনে আমি তারই দিন গনি—
বেঁচে থাকা তবু ব্যর্থ হয়নি,
শান্ত প্রবীণ হেমন্তদিন
তাও লাগে সুমধুর।

যদিও আপন কুলায়ের টানে
বাঁধা হৃদয়ের পাখি,
আতিথেয়তার প্রবাস কখনো
তবু সুখী হয় নাকি ?

সেই মতো এই ছোটো-হ'য়ে-আসা দিন
তারও কাছে মোর কিছু যেন হ'লো ঋণ,
কিছু আলো, কিছু আকাশ, কিছুটা রোদ।
—এই কবিতায় হবে কি সে-ঋণ শোধ?

শীতের সঙ্গে জীবনের শত্রুতা,
মৃত্যুর সখা সে যে;
তবু তো শীতের প্রথম দূতের দল
সোনালি-সুনীলে সেজে
নেচে-নেচে এলো, যেন কত রমণীয়।

ঋতুর ক্রান্তি মনের ক্লান্তি মেজে
সারা পৃথিবীরে আবার করে-যে প্রিয়:
বারে-বারে একই নতুনে রচনা,
তবু সে-নতুন পুরোনো হয় না,
ফিরে-ফিরে যেন আরো বেশি ভালো লাগে
কিছু সুর, কিছু পরশ, কিছু-বা দৃশ্য;
হোক শীত, হোক বর্ষা, হোক-সে গ্রীষ্ম।

হায় রে, মানুষ করেছে ফন্দি
প্রকৃতির হবে প্রতিদ্বন্দ্বী!—
কেড়েছে শক্তি, শেখে নাই তার ছন্দ।

মানবভাগ্য-আবর্তনের
যে-কোনো সূক্ষ্ম ক্রান্তিক্ষণের
হৃৎ-বিদারণ আজও কী দারুণ দ্বন্দ্ব!
প্রকৃতির কোলে যে-নতুন আসে
তারই ছোঁওয়া লেগে বিশ্ব বিকাশে,
এমনকি, পীত শীতের আভাসে
খানিক ঝরায় সুধা,
আর মানুষের ইতিহাস-পটে,
নতুনের রেখা যদি কিছু ফোটে,
অমনি ভীষণ বিস্ফোরণের
অমিত শোণিত নিঃসরণের
মূঢ় ক্রূরতা বিশ্বে ছড়ায়
নরক, মড়ক, ক্ষুধা।

শীত

হে শীত সুন্দর শান্ত, হে উজ্জ্বল নম্র নীল দিন,
উদয়াস্ত সূর্য দিলো উজ্জীবনী শোণিত-শর্করা
বিন্দু-বিন্দু তোমার শিরায় ঢেলে, হ'লে রৌদ্রলীন
তনুর তন্তুর জালে, আকাশের মেঘচিহ্নহীন
মেদশূন্য সৌম্য সুষমায়, উত্তরের তীক্ষ্ণ, কড়া
হাওয়ার স্নায়ুব টানে ;—তবু কেন, তবু কেন জরা
তোমার কুঞ্চিত মুখে আঁকে সূক্ষ্ম মৃত্যুর মহড়া—
কী শীর্ণ কৃপণ আলো, ক্লান্ত, ম্লান, কৃশ তবু দিন !

আমিও, আমিও তা-ই। আমারেও সূর্যের শোণিত
দিলো তার অমরত্ব-স্বত্ব-সার জায়ার জঠরে,
শিশুর সর্বস্ব-স্পর্শে, যুগ্ম-যুক্ত ঘুমের কোটরে—
অফুরন্ত, অন্তহীন !···লজ্জা-ভাঙা আশ্চর্য সম্বিৎ
যেন তীব্র তপ্ত বেগ হৃৎপিণ্ডে কম্পিত মোটরে।···
তবু তাপ, তাপ নেই।···তবু শীত, তবু আসে শীত !

শীতসন্ধ্যার গান

মিলালো দিনের আলো
মুছিলো রঙের রেখা,
শীতের এ-ক্লান্ত আকাশ
আঁধারে রিক্ত একা।
কুয়াশায় কুণ্ঠিত সে,
হতাশায় গুণ্ঠিত সে,
শীতের এ-শূন্য আকাশ
তবু নয় সঙ্গহারা,
আছে তার সন্ধ্যাতারা।

ফুরালো বসন্তদিন
কাননে পাখির মেলা,
আমার এ-শূন্য প্রাণে
নেই আর ফুলের খেলা।
সজ্জায় তার দীনতা,
লজ্জায় তার হীনতা,
তবু এ-রিক্ত হৃদয়
কারো না সঙ্গ যাচে,
আছে তার স্বপ্ন আছে।

বিকেল

গাছের সবুজে রোদের হলুদে গলাগলি,
পাতায়-পাতায় হঠাৎ-হাওয়ার বলাবলি ;
উঁকি দেয় বুকে ভীরু কবিতার ক্ষীণ কলি—
আহা, বিকেল ! সোনার বিকেল !

রুদ্ধ ঘরের রোগশয্যায় কোথা থেকে
করুণ চিকণ রসের লিখন গেলো এঁকে ;
শীতের শুকনো আকাশে রঙের কাঁপে কলি।
—আহা, বিকেল ! ক্ষণিক বিকেল !

রবিবারের দুপুর

পথ দিয়ে যায় যারা, মনে হয় তারা কত সুখী! —
জীবনের চিন্তাহীন তরঙ্গের যেন চঞ্চলতা ;
দেহের আনন্দ ঝরে, ভঙ্গিটুকু হ'য়ে ওঠে কথা,
চোখে-চোখে বিচ্ছুরিত ইচ্ছার অজস্র অযথা—
এর পিছে নেই কোনো দুঃখের সূক্ষ্ম উঁকিঝুঁকি।

উজ্জ্বল আকাশ থেকে আশার প্লাবন যেন নামে।
ঘরে ব'সে কিছু দেখি, তার চেয়ে কিছু কম শুনি ;—
গাছের ছায়ায় এসে দাঁড়িয়েছে তিনটি তরুণী,
রোদের পৌরুষে ঢেলে লাল নীল হলদে বেগুনি
মেয়েলি রঙের ছটা—হেসে-হেসে চ'লে গেলো ট্র্যামে।

দেখি ব'সে মৃদু হাসি পাশাপাশি প্রৌঢ় দম্পতীর ;
যৌবনের গোলকুণ্ড বালিকার আঁচলে লুকোনো ;
দোকানে, বন্ধুর বাড়ি, সিনেমায়, কিংবা অন্য-কোনো
ফূর্তির ফেনায় স্ফীত শহরের অসহিষ্ণু, ঘন,
বিচিত্র শিরায় চলে রবিবার দুপুরের ভিড়।

চেয়ে-চেয়ে দেখি, আর মনে ভাবি এরা কত সুখী।—
প্রমোদের পরে কিন্তু বাড়ি ফিরে কী হবে কে জানে।
কোনো ছোটো কথা থেকে উন্মথিত তর্কের তুফানে
হয়তো সুখের লেখা কেটে দেবে দুঃখের টানে—
কবিতার খশড়ায় হতাশার অন্ধ আঁকিবুঁকি।

পৌষপূর্ণিমা

কিশোর-ঈষৎ-শীত কোনো রাত্রে যদি-বা দৈবাৎ
সচ্ছল শরৎ সাজে, আশ্বিনের ইচ্ছারে যদি-বা
পূর্ণ করে অপুষ্পক অঘ্রানের প্রচ্ছন্ন প্রতিভা

রাশি-রাশি সেই ফুলে, যে-ফুলে কখনো কোনো হাত
আনেনি স্পর্শের জরা ; যার স্পর্শ, যত বাড়ে রাত,
তত নামে নারী হ'য়ে, রক্তমাংসহীন, অপার্থিবা,

অসীমচুম্বনী, তবু চুম্বনের অতীত, অতীবা ;—
যে-গাছের সেই ফুল, তার নীল উল্লাস হঠাৎ
আকাশের শিরা দেয় ভ'রে :—তাতে কী ? কেউ কি ছাখে ?

...বালিগঞ্জে বাড়ির গম্ভীর ভিড় যদি কোনো ফাঁকে
মেলে দেয় একটু সবুজ, ইলেকট্রিক আলো জ্বেলে
অচন্দ্রচেতন যুবা ঘণ্টা দুই ব্যাডমিণ্টন খেলে,

রক্তমাংস তৃপ্তি খোঁজে খাদ্যে, তাপে, ব্যায়ামে, আরামে,
সর্বশেষে ঘুমের ঘনিষ্ঠ কোলে ; একই নিদ্রা নামে
বস্তির ফুর্তিতে আর প্রাসাদের মর্মর বিষাদে :

আকাশে অসীম চাঁদ কলকাতায় শুধু বাদ সাধে
কুখ্যাত পাখির ঘুমে, কর্কশ চীৎকারে দিয়ে ডাক
ফুটপাতের গাছের বিছানা ছেড়ে উড়ে যায়, নীড়

খোঁজে মেঘের নরম মোমে, ব্যর্থ হ'য়ে তীক্ষ্ণ শাঁখ
বাজায়ে নিখাদ কণ্ঠে—উতরোল, উদ্‌ভ্রান্ত, অস্থির,

চাঁদেরে বন্দনা করে শুধু কাক—শুধু কাক—কাক।

পৌষসংক্রান্তি

যদিও ঈষৎ-দীর্ঘ দিন,   তবু কী-দীর্ঘ শীত।
যদিও ক্বচিৎ দক্ষিণের   ক্ষীণ কম্পনে হঠাৎ হাড়ে
বাতাস লাগে ;   তবু উত্তুরে হাওয়ার হাত
এখনও গাছের কাপড় কাড়ে,   সবুজ সোনায় পড়ে ডাকাত,
রুদ্ধ রাত, শীর্ণ দিন।   কৃষ্ণচূড়ার শূন্য ডালে
যদিও একটি ছোট্ট পাতা   দিয়েছে উঁকি,
তবু-তো শীত, এখনও শীত ;   কৃষ্ণচূড়ার অনেক দেরি,
গ্রীষ্ম এখনও অনেক দূর।

কাল থেকে, যাক, পড়লো মাঘ।
আজ দেখি তাই সকাল থেকে
দল বেঁধে পাতা ঝ'রে-ঝ'রে দিলো
আঁচল পেতে,   আসবে ব'লে   বাংলাদেশের বিয়ের ঋতু
রঙিন দিন, উতল রাত।   যুগল রাত, মাঘের রাত
শীতের নয়,   দীর্ঘ নয় ;—   পৃথিবীর যৌবনের দিন
যাদের হৃদয়ে অন্তহীন,   জীবনের উন্মাদ নবীন
গ্রীষ্ম যাদের বাহুতে বাঁধা :—   সেই-সব নব দম্পতীরা
সুখী হোক, আহা, সুখী হোক।
জীবন যখন গ্রীষ্মহীন,
কৃষ্ণচূড়া   ফোটে না আর ;
পৃথিবী শুধু   ছড়ায় জরা,

ঝরায় পাতা,	তখনও তারা

সুখী হোক।

যখন শীত	বাড়ায় হাত,	একলা রাত,	শুকনো বুক,

তখনও হাতে	একটু থাক	একটু তাপ,	একটু সুখ।

ফাল্গুনের গুঞ্জন

আসবে, গ্রীষ্ম, আসবে আবার কৃষ্ণচূড়ার
উষ্ণ শোণিতে, উচ্চ চূড়ার উচ্ছ্বাসে লাল
আকাশের সুখী রেখায়, আসবে শাখায়-শাখায়
সবুজ শিখায়, পথে-পথে-ঝরা আহ্লাদি-লাল-
হলদে গুঁড়োয়, চলতি পথের চপল হাওয়ার
উল্লাসে, আর তীক্ষ্ণ কঠিন শুকনো চাঁপার
রৌদ্র-মদির বৈশাখী সৌগন্ধ্যে ; আবার
আসবে নতুন তরুণমিথুনে তীব্র নেশায়,
মত্ত আশার ইচ্ছা-ছড়ানো পাখায়-পাখায়,
বিশ্বপ্লাবন দৃষ্টিধারায়, চোখের তারায়
স্বর্গবিজয়ী মৌন মন্ত্রে :—কিন্তু আমার
ক্লান্ত হৃদয়ে আসবে কি আর, আসবে আবার,
আমার হৃদয়ে আবার, গ্রীষ্ম, আসবে কি আর ?

বৈশাখী পূর্ণিমা

এবার বৈশাখ কেন ব্যর্থ হ'লো, গর্বিত ঋতুর
পূর্ণিমার লগ্নে কেন হেমন্তের কান্নার ম্লানতা
নেমে এলো অশ্রু-আঁকা জ্যোছনা হ'য়ে, তুমি কি জানো তা,
হে আর্দ্র, হে সংগোপন, হে অব্যক্ত-ঘনিষ্ঠ-সুদূর,
হে হৃদয়, আমার হৃদয়! অন্ধকারে আচ্ছন্ন, আতুর,
তোমার যে-ইচ্ছা আজও মায়ামৃগ-দিগন্তে আনতা,
পার্থিবের মানচিত্রে যে-প্রতিজ্ঞা আজও অমানিতা,
তারই রুদ্ধ নিশ্বাসে কি গ্রীষ্ম কৃশ, বিষণ্ন বিধুর!

কী শীর্ণ, করুণ, ক্লান্ত রাত্রি আজ! কী শূন্য আকাশ!
একটিও তারা নেই ; কুয়াশার নাস্তিক প্রভাবে
অভিন্ন আঁধার আলো, অবিশেষ হতাশা, আশ্বাস।
··· তবু তুমি আছো, চাঁদ! সর্বহারা, গর্বিত স্বভাবে
রূপের সাহস নিয়ে তবু এই রাত্রে দাও দেখা!—
আমারই হৃদয় তুমি! তাই একা, তাই একা!···একা!

অফুরন্ত

হাওয়ার চীৎকারে আমি তোমারেই ফিরেছি ডেকে
দয়া নেই, শান্তি নেই !   দুর্বার, বিশাল, উত্তাল,
ঢেউয়ের উৎসাহ ঢেলে মগ্নতার পাহাড় থেকে
প্রান্তরের সমতলে, দিগন্তের সমান্তরাল
নদী হ'য়ে, জলের দুরন্ত বেগে চকিতে বেঁকে,
তোমার নামের মন্ত্র অন্তহীন, অপরিমিত,
জপিয়েছি পৃথিবীর হৃদয়েরে ; আকাশে এঁকে
ঝড়ের অরাজকতা, বজ্রের বিদ্রোহে উদ্ধৃত
বিদ্যুতের অসহ্য মুহূর্তে আমি নিয়েছি দেখে
আশ্চর্য তোমারে !···শুধু এই !···তারপর আবার
কি অন্ধ-করা-অন্ধকার-কারাগারে, একে-একে
রুদ্ধ হবে ঝড়, ঝর্না, বন্যার উচ্ছ্বাস, আর আমার
সত্তার সত্য !   হাওয়ার চীৎকারে যাবে হেঁকে
অফুরন্ত ভবিষ্যৎ—'সে কে···সে কে···কে !'

স্বর্গ-বীজ

তারা ! ···তারা ! ···স্বর্গ-বীজ ! জ্যোতির জন্মের রতি ! দেবতার
রেতঃস্রোত ! কোন ক্ষেত্র লক্ষ্য তার ? উমার তপস্যা ব্যর্থ, ব্যর্থ উর্বশীর
তপস্যা-মৃগয়া। উষ্ণ আর্দ্র পৃথিবীর নীবীর নিগড়ে
বাঁধেনি শিবির ; পীন ঘন ঘাসের বাসর-গন্ধে
বন্দী সে হ'লো না ; পর্বতে কর্দমে বনে বর্তুল পৃথুল
আতিথ্যের অতন্দ্র আহ্বান পেলো না সন্ধান তার। আর-
কোন, কোন ক্ষেত্র ?···ঐ পার হ'লো ছায়াপথ, কোটি-কোটি বিশ্ব-কলি,
আলোর বিশাল কাল—
কার, কার আকর্ষণে ? ছার মানে উর্বশী-উমারে,
তবু ঝরে ; হার মানে পৃথিবীর নিবিড় প্রার্থনা, তবু ঝরে,
ঝরে স্বর্গ-বীজ। জ্যোতির অমর ঝড় ! দেবতার
দিব্যতার স্রোত !···শুধু ঝরে, কোথাও পড়ে না। আকাশে, আগুনে জলে,
জড়ে, মৃতে, প্রেতে, ভবিষ্যতে ; ঝরে স্ফীত বর্তমানে,
প্রাণের কম্পিত প্রান্তে ;—কোথাও ধরে না, কোথাও না !
—কোথাও না ?···তবু ঝরে কল্প-কল্প ধ'রে, যদি পড়ে, যদি ধরা পড়ে
কোনো কণা জ্যোতি-যোনি কল্পনায়, কবি-কল্পনায় !

মধ্যবয়সের প্রার্থনা

যে-অল্প আমার আছে, সেই স্বল্প সর্বস্ব আমার ;
সব যদি স্বল্প হয়, সে-অল্পের বেশি নেই আর।
তোমারে তা দেবো ব'লে দিনে-দিনে অশান্তির দূত
করেছে প্রস্তুত।

কত স্মিত মুহূর্তেই মনে হ'লো, কিছু নেই বাকি ;
দুঃখের প্রহারে জেগে দেখেছি, লুকায়ে ছিলো ফাঁকি।
কিছু হাতে রেখে দিতে বানিয়ে নিয়েছে ছল-ছুতা
দুর্বল ভীরুতা।

যেখানে সর্বস্ব প্রাপ্য, সেখানে তিলার্ধ যদি খসে,
যা-কিছু দিলাম, তা-ই মূল্যহীন হয় সেই দোষে।
তাই আমি আজও গনি ব্যর্থতার আবর্তের ঢেউ
অনেক দিয়েও।

আমার সর্বস্ব যদি স্বল্প হয়, সব সে তবু-তো ;
তারও নেই সর্বস্বের বেশি, যার ঐশ্বর্য প্রভূত।
আন্তরিক এ-গণিতে অল্প তাই অমিতপ্রতিম ;
সামান্য, অন্তিম।

অনেক এখানে শূন্য, ন্যূনতম একান্ত চরম,
শূন্য আর ভগ্নাংশের মূল্যভেদ মারাত্মক ভ্রম।
এ-ভুল উন্মূল ক'রে হতাশার হাতে তুমি কাড়ো
আরো, আরো, আরো।

তবুও দিইনি সব ; বন্দী দেহে অন্ধতার দ্বিধা
এখনও বিচার করে অনাচারী সুযোগ-সুবিধা।
কবে আর নিঃস্বতার স্বৈরিতায় ছিন্ন হবে বেড়ি !—
আর কত দেরি।

যে-স্বল্প আমার আছে, সে-অল্পের সর্বস্ব তোমার,
সব যদি স্বল্প হয়, সর্বস্ব ব'লেই মূল্য তার।
রাত্রিদিন শান্তিহীন বাজে, শোনো, আমার বীণায়—
'নাও, নাও, নাও।'

কী দীর্ঘ অপেক্ষাকাল ! কী কঠিন তোমার শপথ !
বাঁচায় বঞ্চিত যত, তত আমি তোমারই সম্পদ।
দিনে-দিনে জীবনেরে রিক্ত ক'রে দাও-যে বিদায়
দেহের দ্বিধায়।

তা-ই, তবে তা-ই হোক ! যৌবনের মতোই ঝরুক
অপলাপী অনুকম্পা, অপ্রতিভ-ভীত দুঃখ-সুখ।
যে-আমি তোমার হাতে, তারে আর প্রাকৃত করুণা
কোরো না, কোরো না ।

আঘাতে-আঘাতে আমি তোমারে-তো জেনেছি দুর্বার ;
আর নয় অনুক্রম, হানো আজ সার্বিক উদ্ধার ।
ভুলায়ো না শূন্য-সম অংশেরে একটু ক'রে বড়ো ;
করো, পূর্ণ করো ।

করো শুষ্ক, শুষ্কতর জীবনেরে ; বাণীর নটীকে
মগ্ন করো চৈতন্যের নগ্নতার ভীষণ স্ফটিকে ;—
তবে যদি সর্বশেষ-সর্বস্ব-স্বপ্নেরে দিতে পারি
নিঃশেষে নিঙাড়ি'।

প্রত্যহের ভার

যে-বাণীবিহঙ্গে আমি আনন্দে করেছি অভ্যর্থনা
ছন্দের সুন্দর নীড়ে বার-বার, কখনো ব্যর্থ না
হোক তার বেগচ্যুত পক্ষমুক্ত বায়ুর কম্পন
জীবনের জটিল গ্রন্থিল বৃক্ষে : যে-ছন্দোবন্ধন
দিয়েছি ভাষারে, তার অন্তত আভাস যেন থাকে
বৎসরের আবর্তনে, অদৃষ্টের ক্রূর বাঁকে-বাঁকে,
কুটিল ক্রান্তিতে ; যদি ক্লান্তি আসে, যদি শান্তি যায়,
যদি হৃৎপিণ্ড শুধু হতাশার ডম্বরু বাজায়,
রক্ত শোনে মৃত্যুর মৃদঙ্গ শুধু ; তবুও মনের
চরম চূড়ায় থাক সে-অমর্ত্য অতিথি-ক্ষণের
চিহ্ন, যে-মুহূর্তে বাণীর আত্মারে জেনেছি আপন
সত্তা ব'লে, স্তব্ধ মেনেছি কালেরে, মূঢ় প্রবচন
মরত্বে ; যখন মন অনিচ্ছার অবশ্য-বাঁচার
ভুলেছে ভীষণ ভার, ভুলে গেছে প্রত্যহের ভার।

অন্য প্রভু

রাজত্ব দিয়েছো, প্রভু, সকলেরে : শুধু নয় বাংলার জঙ্গলে
আগুন-রঙের বাঘ, আল্পসের কল্পনা-কৈলাসে
দারুণ ঈগল, বারুণী বরফে তপ্ত তিমি, শুধু
দীপ্ত দৃপ্ত দুর্জয়েরে নয়, দিয়েছো সবারে স্বত্ব
সহজাত রাজত্বের : ঘোলা-জল ধোবার ডোবায়
গলা-ডোবা কালো মোষ ভাদ্রের রোদ্দুরে, গলা-ফোলা, গলা-খোলা ব্যাং
বৃষ্টিশেষ বিকেলের হলুদ রোদ্দুরে, মেঘলা দুপুরে
আকাশে একলা কাক, কার্তিকের রাত্তিরের পোকা, মারীমত্ত মাছি,
রাক্ষস টিকটিকি :—সকলেরে রাজত্ব দিয়েছো, প্রভু, সকলেরই
প্রভুত্ব নিয়েছো মেনে।…এ-স্বারাজ্য-সাম্রাজ্যে শুধু কি
বঞ্চিত শুধু কি আমি ?…আমি কবি !…শুধু আমি
রাজ্যচ্যুত…নির্বাসিত ?…অন্ন, শুধু প্রত্যহের অন্ন দিয়ে
আমার রাজত্ব নিলে কেড়ে ?   শুধু আমি প্রতি মুহূর্তের
অস্তিত্বের অস্বস্তির দাস ?…সত্যি তা-ই ?…না কি আমি, কবি-আমি,
কোলের কুকুর কিংবা জুয়োর ঘোড়ার মতো, সব,
সব স্বত্ব হারায়েছি অন্য, হীন প্রভু মেনে নিয়ে !

মুক্ত মহান উদ্দামতা

আমার মুক্তি অপ্সরীদের সঙ্গে
চম্পকবনে, নর্তকী-নদী-তীরে ;
মধুর মহান উদ্দামতার রঙ্গে
স্বপ্ন-সবুজ সদ্য-কিশোর শৈবাল-সুখে ছাওয়া
চান্দ্র গুহায় নীল-সমুদ্র-তীরে।

মুক্ত মহান উদ্দামতার সঙ্গে
আমার মিলন তীক্ষ্ণ নগ্ন শিখরচূড়ে ;
স্বেচ্ছাচারের স্বচ্ছ হীরক-রঙ্গে
তপোভঙ্গের অবোধ আবেগ আনে উর্বশী-হাওয়া
উচ্চ, নিভৃত, শুভ্র তুষারপুরে।

প্রতিবিম্ব

কীটসের ডাক এসেছিলো ছাব্বিশে ;
মূর্ত কবিতা শেলি
স্পেৎসিয়া উপসাগরের ঢেউয়ে মিশে
করলো যেদিন কেলি,
সেদিন কি আর বায়রন তাঁর
উন্মন নিশ্বাসে
ভেবেছিলেন-যে তাঁকেও অচিরে
নেবে দৈবের অধৈর্য ছিঁড়ে
বন্ধুর পাশে, ঘাসে।

শেলি, বায়রন, কীটসের দিকে
তাকায়ে আত্মহারা,
আমিও ভেবেছি দশটি-বারোটি
অমর কবিতা লিখে
যেন যেতে পারি মর্ত্য জীবন
চব্বিশে ক'রে সারা।

কিন্তু তখন, বলা বাহুল্য,
বয়স সতেরো ছিলো ;
তাই মনে হ'তো, যদি দেহপুরী
মৃত্যুর হাতে আজও যায় চুরি,
তবু জীবনের বিজয়ী মাধুরী
কমবে না এক তিলও।

মনে হ'তো যেন নিছক বাঁচায়
আছে তার সান্ত্বনা,
যে-উন্মত্ত স্বপ্ন আমার
রক্তের রস, বক্ষের হাড়,
হৃৎপিণ্ডের উদ্দামতায়
হৃদয়ের ব্যঞ্জনা।

২

যেখানে কখনো আসেননি বায়রন
পৌঁচেছি আজ প্রাক্-চল্লিশে এসে,
প্রতিবিম্বের সন্ধানে তাই মন
এগোয় না আর শেলির সোনালি দেশে।
আজ বার-বার মনে পড়ে বার-বার
সেই সত্তর সিঁড়ি
আঁকাবাঁকা খাড়া ধাপে-ধাপে উঠে যার
ইএটস পেলেন দেখা
শিখরচূড়ার স্বেচ্ছানুচারিতার,
মত্ত, মহান, একা।

আর বার-বার মনে আসে বার-বার
সে-আকুল আশি বছরের কারুকলা,
মায়াবী আঙুল যার
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মুখে
অতীন্দ্রিয়ের ইন্দ্রধনুকে

করেছে এমন মধুর, ভীষণ
রূপের আলোকে স্নাত ;
যে দেখেছে সে-ই ভেবেছে, স্বর্গ
তবে কি নিঃস্ব দেহেরই অর্ঘ্য,
এ কি মুমূর্ষু মানুষ, অথবা
দেবতা সদ্যোজাত।

৩

যদিও দেহের শুকায়ে আসছে মজ্জা ;
বিদ্রূপে ধিক্কারে
দিনে-দিনে আরো আমাকেই দেবে লজ্জা ;
তবু দিনে-দিনে মনে-মনে আরো ভাবি :
দৈব দয়ায় কিছু যদি থাকে দাবি,
তবে যেন আমি বাঁচি
একশো বছর, অন্তত কাছাকাছি ;
দিনে-দিনে যাতে আরো হ'তে পারি
সান্ত্বনাহীন স্বপ্ন আমারই,
হৃৎপিণ্ডের হৃদয়পদ্মে
চিরন্তনের শয্যা।

যা হবার তা-যে হবেই, আমার
ধৈর্যেরে এই কথা
শিখায়ে-শিখায়ে মেনে নেবে মন
তাপহারা দেহে স্মৃতিমন্থন,

সেবক শোণিতকণার কঠিন
বধির অবাধ্যতা।
বুক-ফাটা বোবা সর্বনাশেরে
হাসি-ঠাট্টার ছলে
ছড়ায়ে উড়ায়ে দেবো অজস্র
বাজে কথা ব'লে-ব'লে।
কেননা যখন আমার অধর আর
অন্য অধরে আনবে না ইচ্ছার
মূর্ছিত সজলতা ;
পারবে না আর তন্ময় বিন্যাসে
নারীর শরীরে বাঁধতে রুদ্ধশ্বাসে
যখন ক্ষয়িত বাহুর নিষ্ফলতা :
হয়তো তখনই আমি
জাগতে পারবো মুক্ত মহান রঙ্গে
উদ্দাম রাত সখা-কৃষ্ণের সঙ্গে ;
তারপর ভোরবেলা
দেখবো, অবোধ উর্বশী তার
করুণ চিকণ বক্ষোচূড়ার
চিত্রবিলাসী স্বচ্ছ সলিলে
একলা করছে খেলা।

পরমা

তোমার তনিমার নব নীড়ে
একদা লভেছিনু অবনীরে।
নাহি-যে পরিমাণ ;
কেমনে করি পান
জীবন-মন্থন নবনীরে।

বেঁধেছি যত সুর বীণাতারে,
সে তব পরশের ঘনতারে
ছন্দে বন্দিয়া
রাখিতে বন্ধিয়া
আকুলা একেলার মনোহারে।

সে-সুখকোমলতা নবনীত
আজিকে হ'লো বুঝি অবসিত ;
রহিলো প'ড়ে নীড় ;
নিখিল-ঘরনীর
নীলিমা ছায়াপথে অবারিত।

ছাড়ায়ে রভসের খরতারে
এসেছি পরশের পরপারে।

দেহ তো শুধু সীমা ;
বিরহ-সুদূরিমা
লঙ্ঘে মিলনের মরতারে

দু'জনে অনিকেত দু'জনেরে
একেলা একেলারে খুঁজে ফেরে।
আমার যে-আপন
করিছে সমাপন
প্রথম নীড়ে-শেখা কূজনেরে।

এ-বীণা নহে আর সুখ-রতা,
কোথা সে-পুলকিত মুখরতা।
অরবে উছলায়
এ-সুর যে-ছলায়
আকাশে ভাষা তার অবিরতা।

যেখানে ভালোবাসা রূপ নিতো
তাহারও পরে গান উপনীত।
কখনো জ্যোছনায়
মাধুরী-রচনায়
সহসা হবে প্রাণে স্বপনিত।

যদি-বা ভুলে যাও অতীতেরে
এ-গান জড়াবে না স্মৃতি-ঘেরে।
   কেবল নিরজনে
   লভিবে নিজ মনে
সুরের রথে চির-অতিথিরে।

বঁধু, এ-অভিসার অভিনব,
আঁধারে মিশে যায় ছবি তব।
   মুছিয়া সব রূপ
   এলো যে-অপরূপ
মন্ত্রে তারই আমি কবি তব।

আঁধার-তলে জ্বলে অনিমিখা
তুলনাহীনা তব কনীনিকা।
   প্রভাতে প্রথমা সে,
   নিশীথে পরমা সে,
মাটির দেহ-দীপে মণি-শিখা।

প্রেমের কবিতা

শুধু নয় সুন্দর অপ্সর-যৌবন,
কম্পিত অধরের চম্পক-চুম্বন।
শুধু নয় কঙ্কণে ক্ষণে-ক্ষণে ঝংকার
আভরণহীনতার, আবরণক্ষীণতার।
শুধু নয় তনিমার তন্ময় বন্ধন।
—কিছু তার দ্বন্দ্ব, কিছু তার ছন্দ।

পুষ্পের নিশ্বাস, রেশমের শিহরণ,
রত্নের রক্তিমা, কনকের নিক্কণ।
গন্ধের বাণী নিয়ে পরশের সুরকার
অঙ্গের অঙ্গনে আনলো যে-উপহার—
সে-তো শুধু বর্ণের নহে গীতগুঞ্জন।
—কিছু তার স্বর্ণ, কিছু তার স্বপ্ন।

বিলসিত বলয়ের মত্ত আবর্তন,
মূর্ছিত রজনীর বিদ্যুৎ-নর্তন।
বিহ্বল বসনের চঞ্চল বীণাতার
উদ্বেল উল্লাসে আঁধারের ভাঙে দ্বার :—
সে কি শুধু উদ্দাম, উন্মাদ মন্থন।
—কিছু তার সজ্জা, কিছু তার লজ্জা।

শুধু নয় দু'জনের হৃদয়ের রঞ্জন,
নয়নের মন্ত্রণা, স্মরণের অঞ্জন।
রঙ্গিণী কবরীর গরবিণী কবিতার
জাদুকর-তির্যক ইঙ্গিত আনে যার,
সে কি শুধু দেহতটে তরঙ্গ-তর্পণ।
—কিছু তার দৃশ্য, কিছু-বা রহস্য।

এসো শুভ লগ্নের উন্মীল সমীরণ,
করো সেই মন্ত্রের মগ্নতা বিকীরণ,
যার দান বিরহের অনিমেষ অভিসার,
মিলনের ক্ষণিকার কণ্ঠের মণিহার;—
সেথা বিজ্ঞানিকের বৃথা অনুবীক্ষণ।
—কিছু তার জৈব, কিছু তার দৈব।

রহস্য

কার কথা আছে লেগে
সন্ধ্যার লাল মেঘে
দেবে না আমায় আজও কি দেবে না জানতে।
কোন জীবনের আশা,
ভুলে-যাওয়া ভালোবাসা
রাঙায় হাওয়ার চলতিপথের প্রান্ত।
সোনায় সিঁদুরে মাখা,
আগুনে আবিরে আঁকা,
স্বপ্নের দেশ কী-আশ্চর্য জ্বলে।
অবোধ কবির প্রাণে
প্রেমের প্রথম টানে
কল্পনা যেন হঠাৎ অবাধ হ'লো।
কত রহস্যে ভরা,
শত বিস্ময়ে গড়া
লাল সন্ধ্যার লম্বা বারান্দায়,
সিঁড়ির বাঁকের কাছে
আজও কি দাঁড়িয়ে আছে
সুন্দরী অতলান্তা মিরান্দা?
বস্তুরূপের ভিড়ে
যা-কিছু রেখেছে ঘিরে
এ-আকাশ তার মুছে নিলো অস্তিত্ব;

শুধু স্থর, শুধু হাওয়া,
নিঃশব্দের ছায়া,
এই সব, সর্বস্ব, এই-তো সত্য।
মৃত্যুর চোখে ধুলো
দিয়ে মুহূর্তগুলো
অমরাবতীর শহরতলিতে এসে,
হঠাৎ উল্টো টানে
মিলালো-যে কোনখানে
মর্ত্য রাতের নিয়তির নীলে মেশা।
মনে হয়েছিলো যারে
পৃথিবীর পরপারে
স্বর্গ-নগর, স্বপ্নের রাজধানী,
ঢেকে দিলো সেই লাল
ক্ষমাহীন ক্ষণকাল,
পাতাল-কালোয় ডুবে গেলো তার মানে
তবু কোনো দূর মেঘে
এখনও কি নেই লেগে
এখানে হারালো যে-অলকনন্দা ?
সে কি এই, সে কি এই,
না কি নেই, না কি নেই—
স্নন্দরী অতলান্তা মিরান্দা।

পথের শপথ

ব্যর্থ হয়েছে দিন,
রাত্রি আমার বৃথা ;
আসো নাই তুমি আসো নাই।
স্বপ্নেই হ'লো লীন
স্বপ্নের পরিচিতা ;
বাসা নাই তার বাসা নাই।
বিরতিবিহীন কাল
চল্লিশে দিলো তাল—
আশা নাই আর আশা নাই।

ছিলো আশা ছিলো কুটিল আঁখির আখরে,
ছিলো বাসা ছিলো বিকচ বুকের চূড়ায়, সুখের শিখরে ;
মনে হয়েছিলো কতবার, যেন চপল চোখের ব্যাকুল রেখায়
অশ্রু-হাসির ছল ক'রে শুধু তোমারে দেখায় ;
মনে হয়েছিলো ঘনচুম্বন-ফেন-উচ্ছল অধর-আধার
সে শুধু উপায়, শুধু উপচার তোমারে সাধার ;
মনে হয়েছিলো তড়িৎ-পরশ লাজুক আঙুলে, উদ্বেল চুলে,
চুলের ঢেউয়ের কোঁকড়া কুলায়ে
তোমারেই যেন আনলো ভুলায়ে
আমার ব্যগ্র মত্ত অধীর হাতের মুঠোয় ;
তোমার আকাশে অদ্ভুত যত চাঁদ ফোটে, তারা নারী হ'য়ে যেন
আমার ঘুমের প্রান্তে লুটোয়—

তনুর ধনুতে কানে-কানে টেনে ছিলা
মুগ্ধ, অবোধ, অমর অতনু
যখন করেছে লীলা।

দিনে-দিনে মোর পূর্ণ হয়েছে
যখনই যে-কোনো বাসনা,
মনে-মনে তারই অনুকম্পনে
শুনেছি তোমার ভাষণা।
আজ চল্লিশে এসে দেখি শেষে
আসো নাই তুমি আসো নাই।

আজকে দেখছি আশা ঝ'রে গেছে, বাসা ভেঙে গেছে, আছে শুধু আছে ভাষা,
আর আছে ভালোবাসা।
তৃপ্ত হয়েছে শতবর্ষের উপবাসী দেহ, পূর্ণ হয়েছে প্রাণ,
তবু গান, কেন গান?
যে-ভালোবাসায় বিবশ, বিশ্বে জড়ায়ে ধরেছি বুকে
স্বর্গ-নরকে উজাড়ি' পলকে ক্ষণিক দুঃখে-সুখে,
যে-ভালোবাসার হৃৎস্পন্দনে দুঃসাহসের হাত
ভেঙেছে সকল গতানুগতির বাঁধ—
সে-ভালোবাসার দান
এখনও হয়নি শেষ,
এখনও আমার গান
জেগে আছে অনিমেষ।

আজও যায় ডেকে চুপে-চুপে সে কে,
কেঁপে-কেঁপে ওঠে প্রাণ,
পেয়ে কার সাড়া হ'লো নীড়হারা
আজও গান, মোর গান?
জানি, সে তোমারই অসীম, অপার,
অপরশ মধুরিমা,
কথা-বোনা পাড়ে আজও চাই যারে
পরাতে রূপের সীমা।
যুবক বয়সে ভেবেছি, তোমার
কোনো দেহে আছে বাসা,
আজ চল্লিশে এসে দেখি শেষে
সে-বাসা আমারই ভাষা।
ভাষার যে-পথে নিত্য চালায়
ভালোবাসা তার যান,
সেই ভাষাকেই ভালোবাসা আজ
করেছে আত্মদান।
যত চলি পথে তত দেখি দূরে
তোমার বিশাল ছায়া ;—
সত্য কি শুধু পথের শপথ?
লক্ষ্য কি তবে মায়া?

প্রৌঢ় প্রেম

নবীন আমার প্রৌঢ় বয়স, প্রৌঢ় তোমার যৌবন,
তোমাতে আমাতে এক জনমের ব্যবধান।
তোমার জীবনে এখনও ফলিত ললিতকলার রূপরস,
আমার জীবন শুধু শিল্পের উপাদান।
বৈদ্যুৎময় অণুর গণিত অদ্ভুত
কত নীহারিকা-বীথিকা কাঁপায়, আঁধারে ভাসায়
কত সূর্যের অর্বুদ বুদ্বুদ ;
সৌরলোকের ঐন্দ্রজালিক তোমার শাণিত তনিমায়
সহসা গণিতে ক্বণিত করেছে মন্ত্রে,
সংখ্যারাশিরে বেঁধেছে দারুণ ছন্দে।
তারই তরঙ্গ-রঙ্গে তোমার অঙ্গে ফুটেছে গুচ্ছ-গুচ্ছ পারিজাত,
আকাশে আলোকে ঢেলেছে ইন্দ্র লক্ষ-লক্ষ লুব্ধ চপল আঁখিপাত।
তোমার দু' আঁখি বৈশাখী মেঘে এঁকে দিলো, যেন বাসনার বেগে
ঐরাবত আর উচ্চৈঃশ্রবা দুর্বার,
সে-আঁখিতারার তেরছা চাহনি যখনই আমারে করেছিলো তাড়া,
জেনেছি আমার নেই আর নেই উদ্ধার।
আজও আছে সেই মায়ার আভাস,
অভাবনীয় লাবণ্য,
হায় রে সে আর নয় সে আমার জন্য।
তোমার ললিত বিলোল আঁচলে, আঁচল-ঝরানো বায়ুহিল্লোলে,
আঁচলে লুকোনো যুগল উতল উচলে,
রূপের রেখার তীক্ষ্ণ ঝলকে, পরশ-রসের উষ্ণ ছলকে

আজও লজ্জার অভিসার, আজও আতিথেয় সৌজন্য,
হায় রে সে আর নয় সে আমার জন্য ।

আমার যেটুকু গৌরব আজ সৌন্দর্যের দৌত্যে,
তোমাতে মূর্ত রূপলক্ষ্মীর বরদান ;
নবীন আমার প্রৌঢ় বয়স, প্রৌঢ় তোমার যৌবন,
তোমাতে আমাতে এক মৃত্যুর ব্যবধান ।
বেঁচে আছো তুমি বেঁচে থাকবারই খুশিতে,
তাই-তো বিশ্ব ব্যস্ত তোমায় তুষিতে ;
আছে শৈশব স্বৈরী স্ববশ অবসরে, আছে কৈশোর তব কৌতূহলের
রৌদ্র-রঙিন ঝরনায়,
আছে জীবনের সফল ফসল ব্যস্ত আঙুলে, ত্রস্ত চরণে
বিলসিত ঘর-করনায় ।
আর আমি আজ বন্দী হয়েছি ছন্দোবন্ধনে,
ভাষার গুঞ্জনে ;
শুক্ল-রাতের একলা জাগার অসম্ভাব্য ভাবায়,
কল্পলোকের আভায় ;
আমার ভাবার ছন্দ, আমার ভাষার স্বপ্ন যদি
ঢেউ তোলে কোনো সুদূর আগামী কল্যে,
আমি বেঁচে আছি সেই কলাকৈবল্যে ।
আসে যায় যারা নবীন-জীবন-বণিক,
সহজ সুখের ধনিক,
মুক্তদুয়ার উদার তোমার প্রাণের প্রাঙ্গণে
ভ্রমর-কম্পনে ;

তাদের হৃদয় জ্বালায় তোমার আঁখির আগুন, আশার আকাশে
যেন উজ্জ্বল সূর্যের শিখা লেলিহান,
তাদের মুখের রেখায় কোণায় রক্তকণায় দুঃসাহসের
উচ্ছ্বাসে জাগে কলরোল ;
জ্বলে আর নেবে চঞ্চল শিখা, নাচে আর থামে পলকে-পলকে ঝলমল
আবার তোমার চোখের তারায় ;
আমি দূর থেকে দেখি চুপে-চুপে, দেখি সেই শিখা হঠাৎ কখন হারায়,
সজল মেঘের কোমল ছোঁওয়ায়
ছলছল করে আবেশে ছায়াচ্ছন্ন ;—
তা-ই নিয়ে, শুধু তা-ই নিয়ে আমি ধন্য।
তোমার সে-চোখে বিকশিত অভিনন্দনে
বাঁধিব ছন্দোবন্ধনে,
আবেগ-লাগানো সিক্ত অধরে, আবেশ-রাঙানো রক্তকপোলে,
তনুর অণুর মন্ত্রমুগ্ধ গণিতে
যদি পারি মোর ভাষার ছন্দে ধ্বনিতে,
যদি তার রূপ ধ'রে দিতে পারি একলা-রাতের ভাবায়,
কল্পলোকের আভায়,
সে কোন অনামী অনুকম্পায়ী আগামী কালের জন্য ;—
তাহ'লেই, শুধু তাহ'লেই আমি ধন্য।

ঝরা ফুলের গান

তরুণী যূথী পরানু তব কালো খোঁপায় ;—
হায় রে পীতমলিন হ'লো :
তোমারও তনুপরশ নাকি ফুলে তাপায় ।

যে-তনুদীপবৃন্তে তুমি জীবনে জ্বলো,
সে-তনুমূল মাটিতে বাঁধা ;
মাটির ফুল কেমনে তার সীমা ছাপায় !

যে-দীপ তার আধার, তা-ই আলোর বাধা ;
বসন্তের মত্ত অলি
বসন্তেরে বিলায়ে দেয় বাসি চাঁপায় ।

তোমার চুলে আকুল করে যে-ফুলকলি
পরালো মালা তারই তো গলে,
মরত্বের যে-অভিশাপ তারে শাপায় ।

মর্ত্য লীলা যখনই শেষ, মনের তলে
অতনু যূথী অন্তহীন
মাটির বুক আবার সেই সুখে কাঁপায়,

যে-সুখে কাঁপে আমার প্রেম রাত্রিদিন
কখনো কোনো কথার ছলে
চিরন্তনের ক্ষণ-পরশ যদি-বা পায় ।

স্বয়ংবরা

সেদিন তুমি ছিলে স্বয়ংবরা।
অন্ধকার রাত্রি ভ'রে
বৃষ্টি তার মন্ত্র পড়ে,
স্পর্শ যেন স্বপ্ন আর
অশ্রু দিয়ে ভরা।
তরুণ তনু পুষ্পবন,
পুষ্পধনুর আমন্ত্রণ ;
রুদ্ধশ্বাসে হৃদয় জপে
চিরন্তন ছড়া।
নিদ্রা আর অনিদ্রার
মধ্যে নামে অঙ্গীকার ;
তবু-তো ভার, সকল ভার
দিলো না তবু ধরা।
সেদিন তুমি ছিলে স্বয়ংবরা।

আবার আজ ঝরে শ্রাবণ-ধারা।
অনিদ্রার একলা রাতে
কল্পনার মন্ত্রণাতে
কাটাই আমি প্রতীক্ষার
তীক্ষ্ণ, ক্ষীণ ফাঁড়া ;—

বুকের ’পরে মুহ্যমান
জলের গান, হাওয়ার তান
অশান্তির দেশান্তরে
যদি-বা দেয় ছাড়া ;
সেই আমার, সেই তোমার
অজ্ঞতার প্রতিজ্ঞার
ব্যর্থতায় হঠাৎ পায়
আকাশময় সাড়া
আবার আজ যদি শ্রাবণ-ধারা।

•

স্বর্গ-মর্ত্য

এখন যদি ঘুমুতে পাই
চাই না বেঁচে থাকতে,
মরতে যদি পাই, তাহ'লে
ঘুমকে বলি, থাকগে।
ম'রে যেতেও চাই না, যদি
স্বর্গ জোটে ভাগ্যে।

জেগে থাকলে বাঁচতে হবেই,
তাই-তো বলি আয় ঘুম,
কিন্তু যত বয়স বাড়ে,
ততই দূরে যায় ঘুম ;
এবং যত রাত্রি বাড়ে
বিলাপ করি হায় ঘুম।

প্রিয়তমা পত্নী আমার
নিয়ে পুত্রকন্যা
আহা, কেমন নিদ্রারসের
মদিরতায় মগ্না ;
কিছুতে আর কী এসে যায়,
যা হচ্ছে তা-ই হোক না।

জেগে-জেগে একলা রাতে
আমার সবই এসে যায়,

যা হয়েছে, হচ্ছে, হবে
পরস্পরে মিশে যায় ;
বেঁচে থাকার ভীষণ ভারে
আমার বাঁচা পিষে যায়।

তাই ভাবি, চল্লিশের পরেও
মিথ্যে কেন ঘর গোছাই ;
মরতে হ'লে মরি, কিন্তু
বাঁচতে হ'লে স্বর্গ চাই।
বাঁচতে গিয়ে হন না বুড়ো,
সেই দেবতার ভাগ্য চাই।

কেমন ক'রে হবে সেটা ?
স্বর্গ সে-তো কল্পনা,
দেবতারাও ইচ্ছা শুধু,
সংখ্যাতে তাই অল্প না।
তাঁদের নিয়ে চিরটা কাল
কতই কাব্য গল্প না!

আসল কথা, বুড়ো হ'য়েও
বেঁচে যদি থাকতে হয়,
তাহ'লে-তো নিজের মনেই
স্বর্গ গ'ড়ে রাখতে হয় ;
সময়হারা স্বপ্ন দিয়ে
দেবতাদের আঁকতে হয়।

সবাই জানে, বেঁচে-বেঁচেই
চোখ যাবে, দাঁত নড়বে ;
অথচ ঠিক কেউ জানে না
কোন তারিখে মরবে।
স্বর্গে ছাড়া এমন বোঝা
কোনখানে আর ধরবে !

তাই মনে হয়, পৃথিবীতে
যা হচ্ছে তা হোক গে,
ঘুম না-এলে ল্যাম্পো জ্বেলে
বসি লেখার যজ্ঞে ;
বাঁচতে হ'লে বাঁচি আমার
মন-বানানো স্বর্গে।

সঙ্গহারা অনিদ্রারে
আর কি এখন ভয় করি,
অমরতার তীব্র রসে
মর জীবন ক্ষয় করি ;
বেঁচে-থাকায় বিকিয়ে দিয়ে
স্বর্গে বাঁচা জয় করি।

কালের কৌতুক

ওগো আধুনিকযুগবতী, আমি তোমার কালের
বছর পনেরো পিছনে থেকেও টাটকা হালের
খানিক খবর আভাসে বাতাসে পাই ;
না-জেনে আমার নয়নে করেছে ঋণী
পন্থচারিণী যত বালিগঞ্জিনী,
তারা, আমি জানি, তারই অবতারণাই।
রোদ্দুরে লাগে কত-না রঙের ছোপ,
ম্যাজেন্টা, নীল, হলদে, হেলিওট্রোপ,
দৃপ্ত স্ববশ নিঃশঙ্কিত চলা ;
পাঁচটি যুবক দাঁড়ায় আচম্বিতে,
ট্র্যামে উঠে তুমি ব'সে পড়ো নিশ্চিতে :
দেখি, আজও আছো যে-অবলা সে-অবলা।
রক্ত-রঙের টুকটুকে ছুটি ঠোঁটে
বিনাচিন্তায় বুকনির খই ফোটে,
যুক্তি জোগায় চোখের লেখার কালো ;
সে-লাল, সে-কালো যদিও প্রসাদ যাচে
গন্ধবণিক রাসায়নিকের কাছে,
তবু ভালো লাগে—কবুল করাই ভালো।
যেটুকু মুখ্য, যত্নে নিয়েছো এঁকে,
অবশিষ্টেরে রত্নে দিয়েছো ঢেকে ;
নেই কোনো ত্রুটি, কিছু নয় এলোমেলো :

রেখেছে লুকায়ে লম্বা চুলের লজ্জা
অতিকুঞ্চিত চতুর কবরীসজ্জা ;—
দেখে-দেখে চোখে সবই যেন স'য়ে এলো।
শুধু কটাক্ষ রাখোনি অস্ত্রাগারে ;—
ভর্তৃঘাতক হ'লেও-বা হ'তে পারে
কণ্টকময় কঙ্কণ কোনোদিন,
কণ্ঠে কনকরজ্জু রয়েছে রাখা,
কর্ণে তোমার যুগল রথের চাকা ;—
ধন্য। তবু-যে মুখশ্রী মসৃণ।
ভেবো না তোমার করতে বসেছি নিন্দে ;
তোমারে দেখেই তারে আমি পারি চিনতে,
যখনই যে-রূপে যেমনই দাও-না দেখা :
ইতিহাস যত বদলাক, অন্তত
আমার মনেই আছে-তো মনের মতো ;
হঠাৎ চোখেও তারই যেন পাই দেখা।

একদা, যখন তরুণ ছিলাম, কত
কালো-কালো চোখে করেছি ইতস্তত :
বলেছি, 'তোমারে লেগেছে আমার ভালো।'
বলা বাহুল্য, বলেছি তা মনে-মনে,
অথবা কবিতা বানায়ে আপন মনে,
মায়াবী টেবিলে জ্বে:লে স্বপ্নের আলো।

ওগো আধুনিকযুগবতী, তারা তোমার চালের
কিছুই শেখেনি, তবু সে-যুগের নতুন কালের
আহ্লাদি ডালে তারা ছিলো মঞ্জরী ;
যেখানে আমার যৌবন গেছে ঝ'রে,
সে-বন তাদের, তারা ছিলো আলো ক'রে :
প্রত্যেকে ফুল, প্রতি ফুল অপ্সরী।
তাদের ভঙ্গি, তাদের লাজুক চলা,
নিশ্বাস নিয়ে অল্প একটু বলা,
আজ আর নেই, আছে শুধু মনে পড়া ;
লাজুক রুলির আওয়াজ যে-হাতে আরো
লাজুক লাগতো, মনে নেই আজ তারও :
আমার বুকেরে তবু সে জপায় ছড়া।
সেই ঝিরিঝিরি হাওয়া-শাড়ি, হায়, কোথায়,
কোথায় ব্যস্ত আঙুল মস্ত খোঁপায় ;
কোথা সিন্দূর, কোথা আশ্রয়-শাঁখা !
যদি সে-পাখিরা আর না-তাকায় ফিরে,
তবু থাকবেই আমার মনের নীড়ে,
থাকবে আমার মনে-পড়া রঙে আঁকা।
তাই বলি, ওগো আধুনিকযুগবতী,
প্রতিমা ক্ষণিকা, দেবী সে-তো শাশ্বতী ;
লক্ষ ফসল, কিন্তু সে একই খেত :
যে-আঁচল ঐ মিলালো পিছের মোড়ে,
আবার তোমার সামনেই, দেখি, ওড়ে
কম্পিত তারই বঙ্কিত সংকেত।

তারপরে—যদি তত ভালো না-ই লাগে
তোমার মুখের অঙ্কিত সংরাগে,
আত্মচেতন অভিমান-অভিনয়,
জেনো, তার দায় তোমার-তো নয় কিছু;
তোমারে ছাড়ায়ে আমি-যে তাকাই পিছু,
আমারই সে-দোষ, আমারই সে-অবিনয়।
আমাদের নিয়ে কালের এ-কৌতুক
চলবেই, ভালো লাগুক বা না-লাগুক ;
মেনে নিতে হবে চুপ ক'রে অন্তত :
বৃথা জিজ্ঞাসা দ্বিধাখণ্ডিত পথে
বর্তমানেরে, অতীতে, ভবিষ্যতে ;—
সে আছে মনেই, সেই-যে মনের মতো।

দোলপূর্ণিমার কবিতা

অতনু ! ধনুতে পরাও ছিলা,
হানো এ-গুমোট, ভাঙো এ-ভাণ ।
অবচেতনের আঁধার খনিতে,
বুদ্ধির অবরুদ্ধ গণিতে
পড়ুক, পড়ুক পঞ্চবাণ ।
ধনবিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান
এনেছে, শুনছি, নব দিক্‌জ্ঞান,
সে-যে শুধু ছলা, করো প্রমাণ ।
হোক নীরক্ত তর্ক পলকে
পুষ্পফলকে ছত্রখান ।
রক্তমাংস-ইচ্ছা-জড়ানো
হৃদয়েরে তুমি আনো ডেকে আনো,
হানো এ-গুমোট, ভাঙো এ-ভাণ ;—
অতনু, ধনুতে পরাও ছিলা !
তাদেরই মর্মে পড়ুক টান
হৃদয়ের পথে ছড়ায় শিলা
পুঁথি-পড়া যারা সুপ্তপ্রাণ ।
উন্মনা হবে মননশীলা,
প্রাজ্ঞেরও নেই পরিত্রাণ ।
তরুণ-তরুণী-প্রণয়লীলা,
চোখের চুমোয় আত্মদান,

রুদ্ধ হবে যে-বুদ্ধির তেজে
এখনো আসেনি সে-বিজ্ঞান।
অতনু!   ধনুতে পরাও ছিলা,
হানো এ-গুমোট, ভাঙো এ-ভাণ
ফণিমনসার মনোবিজ্ঞতা
যে-মন্ত্রে হ'লো মুহ্যমান
মুকুলদলের অনভিজ্ঞতা
তারই তো রটায় উচ্চ তান।
নিঠুর, করুণ, মধুর! তোমার
মৃত্যুবাণেই মুক্তিবাণ।
অতনু, ধনুতে পরাও ছিলা,
হানো এ-গুমোট, ভাঙো এ-ভাণ

কাঁটা

পাখি বসেছিলো গোলাপ-ডালে ;
বিঁধলো বুকে বিঁধলো কাঁটা।
চন্দ্রা দেবীর গোলাপ-গালে
সন্ধ্যারবির একটি রঙিন
লম্বা আঙুল রঙ্গলালের
বিঁধলো চোখে।
বিঁধলো বুকে বুকের তলে
তীক্ষ্ণ ক্ষণিক একটি আঙুল
রক্ত-রঙিন কঠিন ডালে।
সন্ধ্যাছবির অন্ধকারে
ঝরলো পাখি। রঙ্গলালের
চোখের নীড়ে পড়লো ধরা
চন্দ্রা দেবীর চোখের পাখি
সন্ধ্যাতারার ছায়ার তলে।

তুমি প'ড়ে ছিলে গাছের তলে
রক্তে-কাদায় টাটকা মাখা।
রক্তে-সোনায় আগুন-রঙিন
পূর্বরবির হলদে-লালের
একটি সঙিন উর্বশীকে
বিঁধলো বুকে।

বিঁধলো বুকে অন্ধ চোখে
তীক্ষ্ণ কঠিন লম্বা সঙিন
অন্ত্র-ছেঁড়া হলদে-লালে।
রৌদ্ররঙিন গাছের তলে
ঝরলে তুমি। উর্বশী তার
বক্ষোচূড়ার অন্ধ চোখে
তন্দ্রা ভাঙায়, স্বপ্ন জাগায়
ইন্দ্র-চোখের ইন্দ্রনীলে।

লক্ষ্মী-কে

(যে আমাকে বলেছিলো আমি ভাবুক নই)

লক্ষ্মী, তুমি বুঝতে যদি সত্যি-ভাবুকে,
তবে কি আর বাসতে ভালো নকুলবাবুকে !—
কণ্ঠটি যাঁর রঙ্গভরা, তরঙ্গ যাঁর অঙ্গে,
তোমার মতো ছোট্টো রঙিন ফুটফুটে পতঙ্গে
বন্দী করেন সুশ্রী ঠোঁটের মিশ্রিগুঁড়োয় যিনি ;—
মনোহরণ দোকানে যাঁর চলেছে রাতদিনই
দু-চার আনার বেচাকেনার আহ্লাদি হৈ-চৈ,
খুচরো গোনায় ব্যস্তলাজুক চুড়ির রিনিঝিনি।
—লক্ষ্মী, তুমি ঐখানেই বাঁধো তোমার তাঁবু,
আসুন যত বাংলাদেশে আছেন নকুলবাবু ;
তাঁরা তোমায় ডাকবেন প্রজ্ঞাপারমিতা,
তুমি বাঁধবে খোঁপা তাঁদের ভাবুকতার ফিতায়।
তবু জেনো তোমার জন্য এই করি প্রার্থনা :
ভাগ্য তোমায় না যেন দেয় কেবলই বঞ্চনা ;
সুদীর্ঘ হোক আয়ু, এবং দুঃসহ না হোক
শুকনো জরার তীক্ষ্ণ-কঠিন নখ ;
আকাশ যেন তোমার চোখে পায় কিছু উত্তর
ক্রমে-ক্রমে বয়স যখন হবে পঁচাত্তর।
নয়তো, যখন কুকুর-ডাকা রাতে
অনেক কালের ফেলে-রাখা বইয়ের ছেঁড়া পাতায়
দেখতে পাবে হঠাৎ কোনো সত্যিকারের ভাবুক—
কেমন ক'রে সইবে-যে সেই চাবুক, কড়া চাবুক।

নিজের উপর ছড়া

বুদ্ধদেব বসু
যখন ছিলেন শিশু,
রব তুলেছে ঘরে-ঘরে
নানান কিচিরমিচির,
'আরে ছী-ছি ! ছী-ছি !'
কেউ বলেছেন ফ্রেঞ্চো ক'রে
'এ কী ভীষণ শিশু !'
কেউ বলেছেন খাশ বাংলায়
'পশু ! পশু ! পশু !'
'পশুই ভালো,' বলেছিলো
তখন যারা শিশু।

বুদ্ধদেব বসু
এখন তবে অসুর ?
'আরে ছী-ছি, ছী-ছি !
আমরা মিছিমিছি
চমকেছিলাম ; ও কিছু না
কেবল হুশুরমুশুর !'
ক্রুদ্ধ হ'য়ে বলছে, যারা
তখন ছিলো শিশু,
সেদিন হ'লো শ্বশুর।

বুদ্ধদেব বসুঁ
তাহ'লে নন পশু ?
'আরে ছী-ছি, ছী-ছি!'
তুললো চ্যাঁচামেচি
উচ্চ হাসির অট্টরোলে
এখন যারা শিশু :
'সত্যি বটে পশু !
তাই ব'লে কি সিংহ-ভালুক
কিংবা ভীষণ পিশু ?
মিটিং ডেকে ঠিক করেছি
ওটা একটা মেষু।
আরে ছী-ছি, ছী-ছি !
শুনছো না ওর চিঁ-চিঁ ?—
কেলেঙ্কারির আর-কী বাকি,
ভজন করে ঈশু
বুদ্ধদেব বসু!'

হাওয়া দেয়, হাওয়া দেয়

দশখানা খাতা ভরেছি গদ্যে-পদ্যে
দশ থেকে বারো-তেরো বছরের মধ্যে।
গ্রীষ্মমদির দুপুরের নিঃসঙ্গ
অবসরে কত অবোধ নীরব রঙ্গ।
—হাওয়া দেয়, হাওয়া দেয়।
সতেরো বছরে পা দিয়ে ভেবেছি :
কী-ছেলেমানুষি হায় রে !

ত্বরিতে ছড়ালো অধীর মুদ্রাযন্ত্র
পূর্বতিরিশে পঞ্চাশোর্ধ্ব গ্রন্থ।
শত রাত্রির অনিদ্রা দিলো আকুলি'
আমার বুকের সুখের পাখির কাকলি।
—হাওয়া দেয়, হাওয়া দেয়।
আজ মৃদু হেসে ভাবি ব'সে-ব'সে :
কী-ছেলেমানুষি হায় রে !

মায়াবী টেবিলে কুটিল কঠিন হীরকে
মনে হয় আজ চোখে-চোখে দেখি চিরকে ;
বিন্দু-বিন্দু নিঙাড়ি' মনের মজ্জা
অচেতনে চাই পরাতে চেতন সজ্জা।
—আরো দেয়, হাওয়া দেয়।
পঞ্চাশে এসে বলবো কি শেষে :
কী-ছেলেমানুষি হায় রে !

আজীবন অফুরন্ত মনের ব্যঞ্জনা,
আয়োজন পরিমার্জনা, পুন মার্জনা।
অবশেষে ঠিক মৃত্যুর আগে, সত্য
যদি জেনে যাই কীর্তির অমরত্ব :
—তবু দেয়, হাওয়া দেয়!
তালে দিয়ে তাল তবু হাসে কাল :
'কী-ছেলেমানুষি হায় রে।



প্রথম পংক্তির সূচী